মধ্যরাতের ডাক

কল্লোলশ্রী মজুমদার

সত্তরের সেই টালমাটাল সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম চল্লিশের কবিদের রচনাবলির সূত্রে। স্কুলেরউঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসেবে বা সদ্য কলেজে যাওয়া বয়েসের সূত্রে নতুন গজিয়ে ওঠা দাঁতের দংশন - প্রবণতার মতো একটা স্বেচ্ছাচারীও বিদ্রোহী মানসিকতায় সে সাযুজ্য হয়তো কিছুটা স্বাভাবিকও। কিন্তু লেখালেখি মক্‌শো করা শুর সময় থেকেই কী যেন এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম পঞ্চাশের কবিদের প্রতি। পঞ্চাশের প্রায় সকল কবিই - শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোক সরকার প্রমুখ -- অল্পবিস্তর আমাদের সাম্রাজ্যের স্থায়ী শাসক হয়ে পড়েছিলেন। আর সম্রাট তখন কেবল শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আরও সঠিক করে বললে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পদ্যাবলি নিয়ে যেন আচ্ছন্ন করে রাখলেন তারপরের বেশ কিছুটা সময়।
আজ অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে ভাবি সেই আচ্ছন্নতা -- পর্বের কথা। কেন এমনটা? খুব বেশি করে মনে পড়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার কথা। 'অবনী বাড়ি আছো'। চলতে - ফিরতে আওড়ে চলেছি কবিতাটি। কতোটা কী বুঝেছি এখন আর মনে পড়ে না। খুব কিছু বুঝিনি এমনটাই মনে হয়। কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে এমনই জড়িয়ে ধরেছিলো কবিতাটি যে তার বাঁধন আজও খুলতে পারলাম না। সম্পূর্ণ মুখস্ত হয়ে গেল কবিতাটি যতি - চিহ্ন সমেত।

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙমুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে - -
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

কী ছিল এই কবিতায়? আজ এমন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগেকার আবেগটুকু যদি খসিয়ে ফেলি, তবে প্রেক্ষাপট বিচ্ছিন্ন করে তার আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এই কবিতা বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নয়, সামগ্রিক ভাবে পঞ্চাশের কবিদের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুধাবন সহই কবিতাটিকে দেখতে চাই। বস্তুত, পঞ্চাশের কবিদের আবির্ভাবের সময় - চিহ্নটিকে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, হয়, তা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। জনজীবনে শোরগোল পড়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' ঘোষণা করায়। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশভাগ - উদ্বাস্তু সমস্যা সহ স্বাধীনতা তার ইতি - নেতি

মিলিয়েই এক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল দেশটা এসে পড়েছে এক নতুন আরম্ভের সূচনা - বিন্দুতে। কবিত াতেও বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেল চল্লিশের কবিদের সঙ্গে। আসলে 'আধুনিক' শব্দবন্ধের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখিয়ে রবীন্দ্রানুস ারী কবিকুলের পর্ব পেরিয়ে বাংলা আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের শু তিরিশের দশক থেকে। কেউ কেউ এই অ াধুনিকতাকে 'প্রত্ন - আধুনিকতা' নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে যে 'নতুন আরম্ভ' পাওয় া গেল সেই আধুনিকতার নাম দেওয়া হলো 'নব্য - আধুনিকতা'। প্রকৃতপক্ষে প্রত্ন - আধুনিকতা ছিল পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ নির্ভর। কারণ তখন বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। আর প্রথম সারির কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন যথেষ্ট ইংরেজি শিক্ষিত অথবা ইঁরেজির অধ্যাপক। ফলে এইসব কবিদের আশ্রয়স্থল এবং আদর্শ হয়ে উঠলো পশ্চিমী অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ। এ সময়টা পেরিয়ে পরবর্তী চল্লিশ দশকের কবিরা এই অবক্ষয়ী আধুনিকতার বিদ্ধতায় আবার দ্বারস্থ হলেন পশ্চিমী বিপ্লবী আধুনিক কবিদের কাছে। অবশ্যই সাম্যবাদ, ভারতের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এই আকর্ষণ সৃষ্টির একটি বড়ো কারণ। চল্লিশের কবিদের মডেল হয়ে উঠলেন মায়াকোভস্কি, লোরকা, এলুয়ার, নেদা প্রমুখ কবিরা। আর স্বাধীনতা - উত্তরকালের কবিরা - পঞ্চাশের কবিরা - আবার পেরিয়ে যেতে চাইলেন এই নির্ভরতাকেও। তাঁরা ডুব দিতে চাইলেন একান্তই নিজের ভিতরে। উৎকেন্দ্রিক কিছু পশ্চিমী প্রভাব সত্ত্বেও দেখা যায় তাঁরা কেউই বিদেশি গুর মাছে নাড়া বাঁধেননি। তাঁদের কবিতাও হয়ে ওঠে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী।

এ সময়ের প্রেক্ষিতে যদি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৫-৯৫) পদ্যাবলির বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করি, দেখতে পাবো, তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে আসছে একাকিত্বের কথা। যদিও এই নিসঙ্গতা হনন-উন্মুখতার দিকে ধাবিত হয় না, জীবনের মগ্নত াতেই আবার ফিরে আসে। পরাবাস্তব রীতিতে সাজানো চিত্র ও সঙ্গীতময় পংক্তি থেকে ঝরে পড়ে আধুনিক যন্ত্রণাজর্জর সময়ের ইতিকথাগুলি। তবে আধুনিকতাবাদীদের নির্বেদ, বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি তাঁর কবিতার নেই। যদিও শব্দ দিয়ে গড়ে তে ালা কোমল একটি ছবি এঁকে তিনি মুহূর্তেই ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেন তা। অথচ ক্ষিপ্ত এই বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি গভীর আগ্রহে ফুটিয়ে তোলেন জীবনের তুমুল আনন্দগুলির সৃজন - মুহূর্তের আভাসকে। জীবন তাঁর যুযুধান প্রতিপক্ষ হয় না কখনোই। জীবন নিয়ে আনন্দ প্রকাশ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই জেগে থাকে শেষ পর্যন্ত। পরস্পর সহাবস্থান করে মনস্তাপ ও মমতা, আস্তিক্যবোধ ও জীবন - মগ্নতা। তাঁর কবিতার আর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো -- কখনোই নাট্যধর্মী হয়ে না ওঠা। এসবের নিরিখেই দেখতে চাই আমার প্রিয় কবিতাটিকে।

তিন স্তবকে বিন্যস্ত বারো পঙ্‌ক্তির কবিতাটি 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের (প্রকাশ ১৩৭২/ ১৯৬৫) অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি প্রধানত জীবন - মগ্নতারই। রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা যেমন আছে, রয়েছে ছেড়ে য াওয়ার বেদনাও। আর কবিনিজেই এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন -- 'না, এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। 'ধর্ম' মানে ধরণীতে, আর 'জিরাফ' মনে আকাশে আছে। মানে পৃথিবী থেকে শু করে আকাশ পর্যন্ত তুমি খেলে বেড়াতে পারো।" অ ামাদের আলোচ্য কবিতাটিতে এই 'ধর্ম' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য - - বিশেষত 'অবনী' শব্দের অর্থও পৃথিবী। আবার স ামগ্রিকভাবে চল্লিশের কবিদের সঙ্গে পার্থক্য ও শব্দ - ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন - "শব্দ সম্পর্কে আমাদের কে ান ছুৎমার্গ ছিল না, যে কোন শব্দকে আমরা সরাসরি বসাতে পারতাম, যে কোন ছবি।কোন বিশেষ বস্তু নয়, যে কোন বিষয় - - চল্লিশ দশকের কবিদের মধ্যে এগুলি ছিল না। এগুলি আমরা সরাসরি আনতে পেরেছি। এগুলিই তফাৎ।" তবে প্রকরণগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে, দেখা যায়, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি প্রথাসিদ্ধ এবং তা ছন্দে লেখা।কোথাও হঠ াৎ আলোর ঝলক দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই আমরা 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটিকে দেখতে চাইবো।

ভাব - ভাষা ব্যতিরেকে প্রকরণের দিক থেকে দেখা যায় কবিতাটিতে পর্বভাগের এক আশ্চর্য সংযম। নিপিত ছন্দে গড়ে তে ালা প্রতিটি পঙ্‌ক্তি হয় ৫+৫+২ বা ৫+২ পর্ব বিভাজনের সুমিতি বজায় রেখে চলেছে। ফলে ভাবে - ভাষায় এবং চিত্রকল্প ও ছন্দোনির্মাণে তা হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কেন এমন কথা বলছি ভাব - ভাষার আলোচনা করলেই তা পরিস্ফুট হয়েউঠবে। তবে এখন শুধু এটুকু বলা যায় যে, পর্ব বিভাজনের সুষম বিন্যাসে কেবল ঘুরে ঘুরে অ াসতে থাকে মধ্যরাতের এক তীব্র ও আকুল ডাক - 'অবনী বাড়ি আছো?'।

অনেক সময়ই কবি সচেতন প্রয়াসে নয়, এক ঘোরের মধ্যে কবিতা লিখতেন। কবির বন্ধু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছিলেন যে, হিজলীতে লেখা 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি প্রায় ঘোরের মধ্যেই লেখা। কবিও তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন অনেকবার। কবিতাটির প্রথম পাঠে আমাদের কাছে বহিরঙ্গের যে ছবি -- শব্দে সাজানো যে যে দৃশ্য ফুটে ওঠে তাহলো - - দরজা বন্ধ করে সারা পাড়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। কেবল অন্ধকারের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ডাক শুধু ভেসে আসছে - 'অবনী বাড়ি আছো?'। এখানে অবিরাম বৃষ্টি পড়ে। সবুজ ঘাসে চরে বেড়ানো গাভীর মতো মেঘ উড়ে যায়। এই শান্ত ভরভরন্ত পরিবেশে কেবল সে ডাক ভেসে আসতেই থাকে। আর সবাই যেখানে নিদ্রামগ্ন, তখন বেদনা - বিধুরতার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা কবিই কেবল সহসা সে ডাক শুনে ফেলেন। ... কে যেন ডেকেই চলে।

কবিতার বহিরঙ্গের এই ছবিই কি সব? অভিধা অর্থটি কি একটুই? স্নেহ ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক পৃথিবীতে যখন অন্ধকার নেমে আসে, সেই তমসায় কেবল শোনা যায় জীবনের আকুল স্বর। সকলে না শুনতে পেলেও তবু ডাক ওঠে। সে ডাক পৌঁছেও যায় কোন সংবেদী হৃদয়ের কাছে।

তবে এখানেই শেষ নয়। শব্দের অর্থ ধরে ধরে আমরা যদি কবিতাটিতে আমাদের গভীর দৃষ্টি সামনে মেলে রাখি - আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে কবিতাটি। ঝলসে ওঠা প্রতিটি কথার -- প্রতিটি শব্দের গূঢ়তম অর্থ। তখন কবিতাটিকে সাংকেতিকতাময় বলে মনে হতে থাকে। হয়তো বা তা প্রকৃত কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যও। সে বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে আমাদের খুঁজে নিতে হবে 'অবনী' চরিত্রটিকে। কেন ডাক ওঠে 'অবনী বাড়ি আছো?'

কে ছিলেন অবনী? নামের সূত্রে দেখে নেওয়া যেতে পারে 'অবনী বাড়ি আছো' নামেই প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসটিকে। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৯ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকাতে। পরবর্তীকালে - ১৯৭৩ সালে - আনন্দ পাবলিশার্স থেকেগ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় উপন্যাসটি। দেখে নিই সেখানেই বা কেন অবনী? ... ''আমার আপন দাদুর ছোট ভাই। মা -রা তাঁকে 'বড়কা' বলতো। তাঁকে দেখিনি জন্মে, কথা শুনেছি। কী যেন কি করতেন এক সময়। বলার মতন কিছুই করতেন না। কাবলিঅলার কাছে ধার নিয়ে একটি কালো গাই - গ কিনেছিলেন, গোয়াল বানিয়েছিলেন। কত টাকা নিয়েছিলেন, তাও জানি না। হয়তো যৎসামান্যই উপুড়হস্ত করেননি বলেই সে টাকা বাড়তে - বাড়তে একদা শোধের সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল সন্দেহ করি। হঠাৎ কাউকে কিছু নাবলে - কয়ে একদিন উধাও হলেন। বড় বড় চোখ সুদ্দু গাই - গর মতন কালো সন্তান তাঁর আমার দিদিমার কোলে পড়ে রইলো। বড়দাদুর স্ত্রীকে আমরা কনে - দিদিমা বলে ডাকতাম। তাঁর কথা মনে আছে। তিনি পিতৃত্যক্ত পুত্র নিয়ে রয়ে গেলেন। বড় - দাদু বিবাগী হলো বটে, কিন্তু কাবলিঅলার আসার বিরাম হলো না। সে মাসের মধ্যে অন্তত একবার আসবেই। প্রথম প্রথম বিশ্বাস না করে, শেষদিকেওএটা তার অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আসতো, ভিটের মধ্যে ঢুকতো না। রাস্তা থেকেই হেঁড়ে গলায় হাঁক পাড়তো, বড় দাদুর নাম ধরে। দাদুর নাম অবনী। কাবলিওলা তার ধরা গলায় ভাঙ্গা বাংলায় শুধতো, 'এই, অবনীবাবু বাড়ি হ্যায়? বাড়ি আছে? নেই আছে? তো কাঁহা গিয়েছে সে? উহার বহু আছে? বলিয়ে আমি রহমৎ খাঁ আসেছে।'

কেউ তার ডাক - ডুকের কোনো উত্তর দিতো না। ঐখেনে আম গাছের নিচে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একসময় তার গা - তোলা শেকড়ে বসতো। খাতা পেন্সিল বের করে নিড়বিড়ে আঁক কষতো সব। এক - আধ দিন একটু এগিয়ে আসতো ভরসা করে। গোয়ালের ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে কালো গাইয়ের দিকে সতৃষ্ণ চোখে দেখতো। কী ভাবতো কে জানে? ওর মাথার ভেতরের ওজন - দাঁড়িতে, এক পাল্লায় ঐ গাই - গ বসতো বলে অনুমান করি।

সেই বড়দাদু লক্ষপতি হয়ে একদিন ফিরে এলো। টাটায় বিরাট কারবার, ঘর - বাড়ি, জমি - জামা। সে প্রায় দু-তিন যুগ পরেরকথা। বুড়ো থুত্থুড়ো হয়ে গেছে। কী করে কীভাবে তার ভাগ্য ফেরালো, সে আরেক গল্পের বিষয়!'' ''আমরা পরে জিজ্যেস করেছিলুম,কতো টাকা ধার নিয়েছিলে যে তার জন্যে ওভাবে বিবাগী হতে হলো?

কতো, বলবো? থাক্ শুনে কী করবি আর? দশগুনো ফিরিয়ে দিয়েছি।

ছাই দিয়েছে - - যতো গুলপট্টি! রহমৎ করে মাটির নিচে গেছে!

আরে, ওকে কি আর দিতে পেরেছি? ওর ভাই - বেরাদরদের দিয়ে বলেছি - - তোমাদের দেশের রহমৎ - - তার কাছ থেকে সামান্য কিছু নিয়েছিলুম। তাকে তো আর পাচ্ছিনে, তোমাদের হাতে দিলুম। এ - টাকা তো তার দেশেই যাবে?

তার বদলে টাটায় তোমার বাড়ির পাশে একটা রহমৎ - মঞ্জিলই বানিয়ে দিলে পারতে!
হ্যাঁ, ভারি বুদ্ধি ধরো শালা আমার। বাইরের লোক জিগ্যেস করলে উত্তরটা কী দিতুম?
অবনীবাবু, বড়বাবু টাটানগরকা - - সে, এই কাজ করেছে? ছিঃ ছিঃ - - ”

কবিতায় তবে কী বললেন কবি? পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ এ সংসারেও কখনো কখনো অন্ধকার নেমে আসে? আর জীবনের সব দেনা শোধের তাগাদায় সেই মধ্যরাতে রহমতের কণ্ঠে কি ডেকে চলে মৃত্যু? মৃত্যুর অমোঘ ধবনি উপেক্ষা করা যায় না - দুয়ার এঁটে থাকা সত্ত্বেও। অধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী ব্যথার মধ্যে - সুপ্তি ও জাগরণের অর্ধচৈতন্যে গূঢ় এক বেদনার মধ্যে নিমজ্জিত হতে হতেও সে ডাক শোনা যায়। পৃথিবীকে ডাকছে পরা - পৃথিবী। রহমতের সেই ডাক - চিরশীতল মৃত্যুর সেই কড়ানাড়া কেবল গুঞ্জরিত হতে থাকে মধ্যরাতের আকাশে - বাতাসে।
আবার অন্যরকমও মনে হয়, যখন ভাবি - ‘অবনী’ শব্দের অর্থ তো ‘পৃথিবী’, ‘ভূমি’ এবং ‘যে জনসমূহকে রক্ষা করে’। রক্ষকর্তা এই অবনী কবির অন্তরতম দ্বিতীয় সত্তা নয় তো? রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনদেবতা’র মতো? এ কথাই ত্রমশ পল্লবিত হতে থাকে ‘এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে’ বাক্প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘যেতে নাহি দিব’ কবিত ায় ব্যবহৃত একটি ছবির প্রতিতুলনায়। সংশ্লিষ্ট অংশটি এরকম -
...চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।
এখানকার ভরভরন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে খুবই কাছাকাছি চলে আসে ‘ কবিতার শ্যামলিমায় ভরা প্রাকৃতিক দৃশ্যটি। পথের পাশে উদাসীন বৃক্ষরাজি আরর শস্যভারে নত শরতের শস্যক্ষেত্রের রোদ পোহানোর যে মায়াভরা সংসার, তার পাশে আমাদের আলোচ্য কবিতাটিতেও বারোমাস অবিরাম বৃষ্টির সৌজন্যে সৃজনের - প্রাণের যে মহোৎসব ডেগে উঠেছে তাতে সবুজ নালিঘাসের পরাঙমুখতা গভীর থেকে গভীরতর হয়। আর “শুভ্র খণ্ডমেঘ/ মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্র ারত/ সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো/ নীলাম্বরে শুয়ে” রবীন্দ্রনাথের এই ছবির পাশে যদি রাখি শক্তির “এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে” প্রতিমাটিকে, তবে গোবৎসের পরিবর্তে গাভী এবং তাদের শুয়ে থাকার পরিবর্তে তাদের চরে বেড়ানো ছাড়া আর কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। এমন সাদৃশ্যবশত খুবই আগ্রহ জন্মানো স্বাভাবিক এটা জানতে যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী ভাবতেন কবি। তাঁর “ধর্মে আছো জিরাফেও আছো” কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে ভূমিকাতেতিনি জা নিয়েছেনও সে কথা। “আমি খুব সচেতন ভঙ্গিতে জীবনানন্দকে নিয়েছি। আবার রবীন্দ্রনাথকেও নিয়েছি। ‘ধর্মে আছো জির াফেও আছো’তে রবীন্দ্রনাথের মত ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি।” অবশ্যই সে চেষ্টা তাঁকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য। তবু মনে হয়, এমন মায়াময় পৃথিবীতে পরিতৃপ্ত জীবন নিয়ে মেঘ কখনো গাভীর মতো চরে বেড়ায়, কখনো গোৎসের পরিতৃপ্তিতে শুয়ে থাকে। তবে কি নিয়তিতাড়িত ‘অবনী বাড়ি আছো’র অমোঘ এবং মৃত্যু - শীতল ডাকটিরই উত্তর ‘যেতে নাহি দিব’র কাতর আকুতি? আর তাই - ই কি সবুজ নালিঘাস এমন পরাঙমুখ যে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে অভিমানে, আর চেপে ধরছে দুয়ার? বলছে ‘যেতে নাহি দিব’? তাই বোধহয় অনেক বলিষ্ঠস্বরে পরবর্তী সময়ে কবি বলে উঠেছেন - “যেতে পারি/ যে - কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি/ কিন্তু, কেন যাবো? সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো”। না কি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতোই ‘অবনী’ কবিরই অন্তরতম সত্তা, যে ডাক দেয় জীবনেরউদ্বোধনে?
তাহলে দুয়ার এঁটে পাড়ার ঘুমিয়ে থাকা বোধহয় নিরাপত্তাহীনতায়। এতোদিনের আহৃত সম্পদ, তিলে তিলে গড়ে তোল

া ভোগের ভাণ্ডার যেন অপহৃত না হয় তাই কি এই অর্গলবদ্ধ জীবনযাপন? এ ঘুমিয়ে থাকা তবে বহির্জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতায়, স্বার্থপরতায়, উদাসীনতায় ডুবে থাকা। বাইরে যেখানে রৌদ্রালোকিত শস্যশ্যামল পৃথিবী, সেখানে এই পাড়ায় কেন মধ্যরাত? কেন বাইরের পরিবর্তনশীল পৃথিবী থেকে আধুনিক মানুষ মুখ ফিরিয়ে মনে দুয়ার এঁটে দিচ্ছে? তাই বোধহয় 'ছোট আমি'র দুয়ার আঁটা জীবনে 'বড় আমি' ডাকছে - অবনী বাড়ি আছো? গভীর রাতের অন্ধকারে 'জনসমূহের রক্ষাকারী ত্রাতা' তোমাকে ইতিহাস ডাকছে।

'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' - - থাকে না বলেই, মধ্যরাত্রির ভরভরন্ত সংসারে - পার্থিব সুখের চরিতার্থতার মাঝেও - বিষয়াসক্তির সবুজ নালিঘাসের, অপত্য স্নেহের পরাঙমুখতা - প্রতিকূলতা পেরিয়ে সে ডাক এসে পৌঁছয় - অবনী বাড়ি আছো? নিশ্চেতনার পরমক্ষণে সে ডাক এসে পৌঁছয় কবির কানে। এ অর্গলবদ্ধ জীবনের বেদনায় ব্যথাতুর কবির কাছে সহসা ভেসে আছে সেই ডাক - ওঠো, জাগো। কবি - চৈতন্য জাগ্রত বলেই কেবল তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ইতিহাস - চেতন ার সে - ডাক, নিয়ন্ত্রা - শক্তির সে - ডাক তিনি সহসা শুনে ফেলেন।

কেউ কেউ 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটিতে Walter de le mare -এর 'The Listeners'কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজি কবিতাটি শু হচ্ছে অনিশ্চয়তাব্যঞ্জক একটি প্রশ্নবাক্য দিয়ে - 'Is there anybody'? । আর কবিতাটিতে দেখি এক অলৌকিক জগতের আবহ। এক চন্দ্রালোকিত রাতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া পথিকের মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। চারিদিকের ভৌতিক আবহে এক ভগ্নকুটীর। এই মনে হয় সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো চলমান অশরীরী শ্রোতা। ফাঁকা ঘরে উড়ে বেড়াতে থাকে হাহাকার। ঘরে কেউ আছে কি না জানার জন্য পথিক প্রশ্ন করছে -- 'Is There anybody?'। অথচ 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতায় প্রশ্নটি অতি - নির্দেশক এবং আবহটিও অলৌকিকতার পরিবর্তে আম াদের প্রতিদিনকার দেখা শস্যশ্যামল প্রকৃতি। কাজেই দুটি কবিতার মধ্যে সম্পর্ক বহু দূরবর্তী বলেই মনে হয়।

আমাদের আলোচ্য কবিতাটির বিষয়ে অন্য এক প্রসঙ্গের অবতারণাও, হয়তো নেহাতই আবেগবশত, তবু লিপিবদ্ধ থাক বলেই মনে হলো। সত্তরের যে টালমাটাল সময়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম লেখার শুতেই, সে সময় পাড়ায় পাড়ায় মধ্যরাতে কালো গাড়ি আনাগোনা ছিল নেহাতই এক স্বাভাবিক ঘটনা। আতঙ্কে জড়সড় পাড়া আক্ষরিক অর্থেই দুয়ার এঁটে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতো। আর সেই নিস্তব্ধতায় পাড়া জাগিয়ে, কড়া নেড়ে গোয়েন্দা - পুলিশের জিজ্ঞাসা 'অবনী বাড়ি আছো?' প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই বহু আগে লেখা কবিতাটিও তার অর্থের বিস্ত ার ঘটিয়ে এসে পড়েছিলো পরের এক সময়ে। নিখাদ শান্তির পরিমণ্ডলে এই ডাক যেন হয়ে উঠেছিল মূর্তিমান বিভীষিক ার এক রূপকল্প। সম্প্রসারিত ভাবনা ও দূরদৃষ্টির জন্যও কবিতাটি উল্লেখনীয় হয়ে ওঠার অন্যতম এক কারণ বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়। তবে এমনও হতে পারে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাম আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি ঘটা এমন বহু ঘটনারই হয়তো তিনি সাক্ষী ছিলেন। হয়তো সেই ছবিই উঠে এসেছে এ কবিতায়। আর পরবর্তী এক সময়ে সে ছবির সমাপতন ঘটায় বেশ আশর্চ্য হয়েছিলাম কবিতাটি সম্পর্কে।

সত্তর দশক থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কবিতাটি এক - অর্থ অন্য - অর্থ প্রকাশ করতে করতে তার পরতে পরতে জমিয়ে ফেলেছে অর্থ - বদলের বহু স্তর। কবিতার বহু - অর্থের এই পর্যায়গুলি অনুধাবন করতে গিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে তা। রহস্য উন্মোচন প্রয়াসকে মাঝে মাঝে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো মনে হয়। বহু পরতে জমে থাকা রহস্য - খোসা ছাড়ানোতে কেবল মুগন্ধতাই ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন একটি স্ফটিক - পাথরের বিভিন্ন দিকে আলো পড়লে নানা বর্ণের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার পৃষ্ঠতল, তেমনই মনে হয় কবিতাটিকে। আর সেই উদ্ভাসনের প্রতি গভীর মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার মধ্যে ফিরে - ফিরে কেবল ডাক ওঠে - 'অবনী বাড়ি আছো?'। মধ্যরাতেব সে এক তীব্র আকুল ডাক।